অনুবাদকের চোখে অসমিয়া-বাংলা সংস্কৃতির সমন্বয়,অস্তিত্বের সঙ্কট এবং উত্তরণ

বাসুদেব দাস

বিদেশি শাসকদের শাসনকার্যের সুবিধের জন্য একসময় অসমে অসমিয়া ভাষাকে বিতাড়িত করে বাংলা ভাষাকে রাজ্যিক ভাষার স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল। সেটা ছিল অসমিয়া জাতীয় জীবনে বড়ই বেদনার দিন। নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য অসমিয়া ভাষার পুনঃপ্রতিষ্ঠা তাদের জীবনের অন্যতম কর্তব্য হয়ে পড়ে। যে ভাষার উপর বাংলার উপভাষার তকমা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল তাকে দীর্ঘকাল লড়াই করে নিজের একটি স্বতন্ত্র এবং সম্মানজনক অবস্থান তৈরি করে নিতে অতিক্রান্ত হয়েছে দীর্ঘকাল। ইতিমধ্যে একটি উন্নত ভাষার সংস্পর্শে এসে অসমিয়া জনজীবনে নবজাগরণের পরশ লেগেছে। তাদের নিজস্ব সাহিত্য সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। আমার বক্তব্যের বিষয় হবে একজন অনুবাদকের দৃষ্টিতে অসমিয়া জনজীবনের এই অস্তিত্বের সংগ্রাম,বেঁচে থাকার লড়াই কীভাবে অসমিয়া কথা সাহিত্যে বিশেষ করে প্রতিফলিত হয়েছে তার বিচার এবং বিশ্লেষণ। আমাদের মনে রাখতে হবে যে একদিন যে অসমিয়া ভাষাকে তারচেয়ে উন্নততর একটি ভাষা অর্থাৎ বাংলা ভাষা কোনঠাসা করে রেখেছিল আজ সেই ভাষারই গল্প উপন্যাস অনূদিত হচ্ছে বাংলায় এবং তা বৃহত্তর পটভূমিতে নিজেদের জায়গা করে নিতে সমর্থ হচ্ছে। এভাবেই আজ প্রান্তীয় ভাষাটি উঠে আসছে মূল স্রোতের পাশে। একজন অনুবাদক হিসেবে আমার অবস্থানটি বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। আমার মাতৃভাষা বাংলা। আমি অনুবাদের মাধ্যমে উৎস ভাষা থেকে উদ্দিষ্ট ভাষায় সেই ভাষার সাহিত্য এবং সংস্কৃতিকে নিয়ে যেতে চেষ্টা করছি যে উৎস ভাষাটিকে একসময় আমার উদ্দিষ্ট ভাষা কোণঠাসা করে রেখেছিল। এ যেন অনেকটা আমার পূর্বপুরুষের কৃত পাপের পরিমাণ লাঘব করার চেষ্টা। অতীতের সমস্ত ভেদোভেদ ভুলে গিয়ে পরস্পরের মধ্যে একটা ঐক্য বন্ধনের প্রয়াস।

আমার আলোচনাকে একটু বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখারও প্রয়াস থাকবে। দেশভাগের বলি অসংখ্য মানুষ সব হারিয়ে উত্তর পূর্বাঞ্চলে এসে নতুন করে বাঁচার জন্য সংগ্রাম শুরু করে যখনই তাদের পায়ের নিচে এক টুকরো শক্ত জমি পেতে শুরু করেছে তখন 'বিদেশি খেদা' আন্দোলন তাদের সমগ্র সত্তাকে নাড়িয়ে দিয়ে নিজেদের অস্তিত্বকে সন্দিহান করে তোলে। উত্তরপূর্বাঞ্চলের বাংলা ছোটগল্পে এই অস্তিত্বের সমস্যা এক বেদনা বিধুর চিত্রকে ফুটিয়ে তুলেছে। আমার আলোচনায় এই বেদনাকে স্পর্শ করার প্রয়াস ও থাকবে।

উনবিংশ শতকে অসমিয়া বাঙ্গালির সাংস্কৃতিক জীবনে এক অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছিল। উনিশ শতকের শুরু থেকেই হলিরাম ঢেকিয়াল ফুকন (১৮০২-৩২),যজ্ঞরাম খারঘরীয়া ফুকন (১৮০৫--৩৮),যদুরাম ডেকা বরুয়া (১৮০১-৬৯),মণিরাম দেওয়ানের (১৮০৬-৫৮) মাধ্যমে বঙ্গের প্রভাব অসমিয়া জীবন যাত্রাকে স্পর্শ করেছিল। এঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন 'আসাম দেশীয় অতি মান্য লোক'। 'সমাচার দর্পণ','সমাচার চন্দ্রিকা','সম্বাদ প্রভাকর','বঙ্গদূত' ইত্যাদি বাংলা সংবাদপত্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের ফলে বঙ্গের নতুন ধ্যান-ধারণা এবং সমাজ চেতনার ধারাটিকে এঁরা অসমে বহন করে নিয়ে এসেছিলেন। তাঁরা কেবলমাত্র বাংলা সংবাদপত্রের গ্রাহক বা পাঠকই ছিলেন না ,লেখক এবং অসমের সংবাদ প্রেরক ও ছিলেন। বাংলা সংবাদপত্রের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগের ফলে তাঁদের মন হয়ে উঠেছিল কলকাতামুখি ,মানসিকভাবে তাঁরা মোটামুটি কলকাতাতেই বাস করতেন।

বাংলা ভাষায় অসমের বুরঞ্জী (ইতিহাস) এবং কামরূপের যাত্রা পদ্ধতির প্রণেতা হলিরাম ঢেকিয়াল ফুকনের চিঠি-পত্র, যজ্ঞরামের করা ইংরেজি কবিতার বাংলা অনুবাদ,মণিরাম দেওয়ানের সম্পাদকের কাছে লেখা চিঠি সমকালীন বাংলা সংবাদ পত্রে একদিকে যেমন অসমিয়া মনীষার পরিচায়ক তেমনই অন্যদিক দিয়ে বঙ্গ -অসমের সংস্কৃতির সংযোগকারকও । স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারে হলিরামের উদ্যমশীলতা,বিধবা-বিবাহ সম্পাদনে যজ্ঞরামের অগ্রসরতা,বাংলা অসমিয়া অভিধান প্রণয়নে যদুরামের আত্মমগ্নতা এবং অসমের সামাজিক সংস্কৃতির ইতিহাস কথনে মণিরামের স্বদেশপ্রাণতা এই সবকিছুর মূলেই অসমের প্রতিবেশী বঙ্গ এবং ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী কলকাতার প্রভাব বর্তমান।

অসমের শিক্ষিত সমাজের অগ্রণী অংশের চিন্তা-চর্চায় বঙ্গীয় নবজাগরণের প্রভাব কীভাবে এবং কতদূর কার্যকরী হয়েছিল সেই বিষয়ে ইতিমধ্যে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা,গ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়েছে। বিশিষ্ট গবেষক অমলেন্দু গুহ রচিত 'The Impact of Bengal Renaissance' শীর্ষক প্রবন্ধটি সম্ভবতঃ এই বিষয়ে সবচেয়ে মূল্যবান তথ্যসমৃদ্ধ রচনা। মননশীল লেখক হীরেন গোঁহাই তাঁর একাধিক প্রবন্ধে এই বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন।

বঙ্গের সামাজিক ইতিহাসের অনেক বিষয় ,যেমন সতী-দাহ,বিধবা-বিবাহ,বহু-বিবাহ ইত্যাদির পক্ষে বিপক্ষে সংঘটিত আলোড়ন এবং রায়তের উপর জমিদারের নির্যাতন বা ব্রাহ্মধর্ম উনবিংশ শতকের অসমের সমাজ জীবনে অনুপস্থিত। দেশীয়

ভাষার বিপর্যয় বিষয়েও অসম এবং বঙ্গের মধ্যে কোনো ধরনের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায় না। যে সময়ে অসমে অসমিয়ারা নিজেদের ভাষা ও সাহিত্য চর্চা থেকে পুরোপুরি বঞ্চিত ছিল (১৮৩৬--১৮৭২) ,তারও অনেক আগে থেকে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ এবং শ্রীরামপুর মিশনের উদ্যোগে বঙ্গে বাংলাভাষায় গ্রন্থ রচিত এবং প্রকাশিত হয়ে আসছিল। উইলিয়ম কেরী,মার্শম্যান এবং অন্যান্য ইউরোপীয় ধর্মপ্রচারকরা নিজেদের রচিত বা পণ্ডিতদের দ্বারা প্রণয়ণ করা বিভিন্ন বিষয়ের বাংলা পাঠ্যপুঁথি এই শতকের গোড়াতেই প্রকাশিত হয়েছিল।

অসমিয়া ভাষার গদ্য বাংলা গদ্যের চেয়ে কয়েক শত বছরের পুরোনো হওয়া সত্ত্বেও এই শতকের প্রথমদিকে সংঘটিত ভাষিক বিপর্যয়ের ফলে অসমিয়া গদ্য আধুনিক রূপ লাভ করায় অনেক দেরি হয়ে যায়। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বিলেত থেকে আগত সিভিলিয়ান কর্মচারিদের বাংলা শেখানোর প্রয়োজন দেখা দেওয়ায় বাংলা ভাষার অভিধান,ব্যাকরণ ইত্যাদি গ্রন্থের প্রকাশ সম্ভব হয়ে উঠে। অপরদিকে এই শতিকার দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত অসমিয়া ভাষায় গ্রন্থ প্রকাশের তেমন কোনো উদ্যোগ লক্ষ্য করা যায় না। তার কারণ অবশ্য অষ্টম দশক পর্যন্ত অসমের সরকারি ভাষা হিসেবে অসমিয়া ভাষার পরিবর্তে বাংলা ভাষার প্রচলন। অবস্থার এই বৈপরীত্য এবং সামাজিক পরিস্থিতির এই বৈসাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও বঙ্গের সামাজিক জীবনের প্রভাব উনবিংশ শতকের অসমের উপর অনিবার্যভাবেই পড়েছিল।

দেশভাগের ফলে বাঙ্গালি জীবনে যে অস্তিত্বের সঙ্কট ঘনিয়ে এসেছিল তা নিয়ে বাংলায় অনেক ছোটগল্প,কবিতা,নাটক এবং উপন্যাস রচিত হয়েছে। অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে’ তো বাঙ্গালি জীবনের অবশ্য পাঠ্য গ্রন্থে পরিণত হয়েছে। তবে দেশভাগের বলি এই মানুষগুলোর জীবনের অস্তিত্বের সঙ্কট নিয়ে যে অসমিয়া ভাষাতেও কয়েকটি অসামান্য উপন্যাস ও ছোটগল্প রচিত হয়েছে তার খবর হয়তো আমরা অনেকেই রাখি না। দেশভাগের ফলে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের প্রত্যক্ষ প্রভাব বাঙালি জীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল, অসমিয়া সমাজ জীবনে সেরকম কোনো ঘটনা ঘটেনি। বাঙালিদের মতো অসমিয়াদের যথাসর্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে পূর্বপুরুষের ভিটে ছেড়ে চলে যেতে হয়নি। তাই বাস্তুভিটা ত্যাগ করে যাবার যে বেদনা তা অসমিয়া সাহিত্যে প্রতিফলিত হতে দেখা যায় না। তবে দেশভাগের ফলে হাজার হাজার উদ্বাস্তুর অসমে অনুপ্রবেশের ফলে অসমিয়া সমাজ জীবনে যে অস্তিত্বের সঙ্কট ঘনিয়ে এসেছিল তার ছবি অসমিয়া ছোটগল্প এবং উপন্যাসে বিরল নয়।

দীপককুমার বরকাকতির উপন্যাস ‘উপত্যকার পরা উপত্যকা লৈ’ (উপত্যকা থেকে উপত্যকায়) এর পটভূমি সুরমা উপত্যকার সিলেট,বরাক উপত্যকার কাছাড় এবং নগাঁও উপত্যকার অন্যান্য অঞ্চল। পূর্ব পাকিস্তান সৃষ্টির পরে রাজনৈতিক অস্থিরতা হেতু প্রচুর বঙ্গভাষী অসমের বরাক উপত্যকায় প্রবেশ করে। তারপর ধীরেধীরে তাঁরা ব্রহ্মপুত্র উপত্যকাতেও ছড়িয়ে পড়ে। হিন্দু উদ্বাস্তুদের অনুসরণ করে পরবর্তীকালে অনেক মুসলমান পরিবারও এসে এই সব অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। উপন্যাসে প্রাক-স্বাধীনতা কালের পূর্ব-বঙ্গের জমিদারী প্রথা ,সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা,স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে পাকিস্তানের জন্মলগ্ন পর্যন্ত পূর্ববঙ্গের হিন্দু এবং মুলমানদের অসমের উর্বর এবং জনবসতিশূন্য অঞ্চলগুলিতে প্রব্রজনের কথা লিপিবদ্ধ হয়েছে। ১৯৬০ সনের অসমের ভাষা আন্দোলন এবং পরবর্তীকালের ১৯৮০ এর দশকের বিদেশী বিতাড়ন আন্দোলন এই সব সর্বহারা মানুষের জীবনে যে অস্থিরতার সৃষ্টি করেছিল তারই এক জীবন্ত চিত্র আলোচ্য উপন্যাসে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। উপন্যাসের মূল চরিত্র কালীকিশোর শিক্ষিত,কর্মের প্রতি নিস্পৃহ,সফলতার প্রতি বিবাগী। জমিদার পরিবারের ছেলে বলে দেশ বিভাগের আগে কাজ করার কোনোরকম তাগিদ বা প্রয়োজন অনুভব করেনি। আজ আর্থিক দুরবস্থায় পড়ে এতদিনের অভ্যাস পাল্টাতে হয়েছে। সে উপলব্ধি করেছে মানুষের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন অর্থনৈতিক নিরাপত্তা আর সামাজিক অবস্থান। নগাঁওয়ের কাছে ছোট একটা শহরে যখন সে কিছুটা আর্থিক আর সামাজিক নিরাপত্তা বোধ করছে ঠিক তখনই অসম আন্দোলনের জোয়ার সমস্ত কিছু ওলট পালট করে দিয়েছে। কালীকিশোরের মতো একজন সাধারণ চরিত্রের জীবনযাত্রার মাধ্যমে ‘ঔপন্যাসিক বরকাকতি রাজনৈতিক বাস্তব এবং পরিসংখ্যার তত্ত্বকে মূর্ত করে তুলতে চেয়েছেন। দেশ বিভাজন,সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ,উদ্বাস্তু এবং পুনর্বাসনের মতো জটিল বিষয়গুলোর মানবীয় দিকটি তুলে ধরতে লেখক অনেকটাই সফল হয়েছেন।

অরুণ শর্মার উপন্যাস ‘আশীর্বাদর রং’ (আশীর্বাদের রঙ) দেশভাগের পটভূমিতে রচিত উপন্যাস। প্রকাশকাল ১৯৯৬। উপন্যাসের কাহিনি শুরু হয়েছে ১৯৩৫ সালে,শেষ অসম আন্দোলনে। লেখক এই সময়কার অসমের গ্রামাঞ্চলের সামাজিক অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক পরিবেশের কলাত্মাক আভাস দেবার চেষ্টা করেছেন। স্বাধীনতা লাভের পরে একটা দুষ্টচক্র কুরৈগুরি চাপরিতে বসবাস করা অভিবাসী মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। গজেন সে কথা জানতে পারলেও কোনো প্রতিকার

করতে পারে না। ফলে তাঁর জীবনে নানারকম দুঃখদুর্দশা নেমে আসে। রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ এবং মুসলিম লীগ অসমে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছড়াতে চেষ্টা করে। তবে সাধারণ মানুষ মৌলবাদীদের প্রলোভনে নিজেদের শুভবুদ্ধি বিসর্জন না দিয়ে মৌলবাদীদের হাত থেকে দেশকে বাঁচাতে সচেষ্ট হয়। --'পাকিস্তান অইলে আমরা কেন যাইমু? সেখানে গিয়া আমরা কি অতখানি মাটি আবাদ পাইমু? এরকম ফসল হইবে তাতে? কত কষ্ট কইরা এখানে অতখানি মাটি ভাইঙ্গা লৈছি। বাড়ি বানিয়াছি, ' খেত কইরাছি,অহমীয়া ভাইদের বাড়িতে গিয়া বিয়া বিয়া পরব পূজা পার্বণ একসঙ্গে খাওয়া ,দাওয়া করতাছি,বিহু দেখতে গিয়াছি...কেমন কইরা ছাড়ব এই জায়গা গজেন ভায়া। ' তাঁদের আশ্বস্ত করে গজেন বলেছে --'মৌলবিরা তোমাদের মনে এ ধরনের সন্দেহ ঢুকিয়ে দিয়েছে যদিও,আমি বলতে পারি অন্তত এখানে তোমাদের কোনোরকম অসুবিধে ঘটতে দেব না,জেনে রাখ।' গজেনের এই প্রুতিশ্রুতি শতাব্দী প্রাচীন অসমিয়া মানুষের মানবতাবোধের পরিচায়ক। কিন্তু ধনকুবের রক্ত পিশাচদের উন্মুক্ত তাণ্ডবের কাছে গজেনের এই প্রতিশ্রুতি বাস্তবে রক্ষিত হয়নি। মনসুরদের পক্ষে এই দেশকে আপন করে নেওয়া এত সহজ নয়নি। মৌজাদার এবং যাদব বরাদের অনুচরেরা তাঁদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিয়ে প্রায় সমস্ত গ্রামের মানুষদের হত্যা করে কুরৈগুরির চাপরিকে শ্মশানে পরিণত করেছে। হামলাবাজদের উদ্দেশ্য ছিল কুরৈগুরির মানুষদের উর্বর জমিটুকু আত্মসাৎ করা। শেষপর্যন্ত হাসিনা কুরৈগ্রামের নির্মমতা এবং নিষ্ঠুরতার একমাত্র সাক্ষী হয়ে বেঁচে থাকে। গজেন হাসিনাকে আশ্রয় দিতে বাধ্যহয়। হাসিনাকে বিয়ে করে গজেন ধর্মান্তরিত হয়।

পূরবী বরমুদৈ রচিত 'নদী বিচরা মানুহ' উপন্যাসটি পূর্ববাংলা থেকে অসমে শরনার্থী হয়ে চালে আসা সহজ সরল মানুষগুলোর জীবনের দুঃখ বেদনাকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে। রসিদ মিঞা,জ্যোৎস্না,রেশমাবিবি,মইনুল পদ্মা-ধলেশ্বরীর দেশের মানুষ। তাদের জীবন পরিচালিত হয় নদীর ওঠানামার সঙ্গে। নদীর কলকল ধ্বনি শুনতে না পেলে ,নদীর সুবাস নাকে না গেলে মানুষগুলো বেঁচে থাকার আনন্দ খুঁজে পায় না। দুঃখ দারিদ্র্যে জর্জরিত মানুষগুলোকে মইনুল নামে এক দেবদূত স্বপ্ন দেখায়। সেই স্বপ্ন নতুন দেশে যাবার। সেই নতুন দেশে নাকি কোনোরকম দুঃখ নেই। নদীতে মাছ রয়েছে,খেতে খেটে খাবার সুযোগ রয়েছে। মইনুলের কথা শুনে মানুষগুলো এক নতুন আশায় বুক বাঁধে। পুরুষানুক্রমে বসবাস করা জন্মভূমির মায়া ত্যাগ করে মানুষগুলো একদিন মইনুলের তত্ত্বাবধানে পাবনা,সিরাজগঞ্জ পার হয়ে নিরুদ্দেশের দিকে এগিয়ে চলে। একদিন মইনুল সবার সর্বস্ব চুরি করে উধাও হয়ে যায়। এই অপ্রত্যাশিত আঘাতে মানুষগুলো মানসিকভাবে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়। ত্রিশঙ্কু অবস্থায় তারা এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় তাড়া খেয়ে ঘুরে বেড়ায়। প্রথমদিকে পাট এবং ধানখেতে দৈনিক হাজিরা হিসেবে কাজ শুরু করে তারা। শুরু হয় এইসব অসহায় মানুষগুলোকে নিয়ে রাজনীতির সেই চিরন্তন খেলা। জব্বর মিঞার মতো দালালরা সুযোগ বুঝে রেশন কার্ড আর ভোটের লিস্টে নাম উঠাবার নাম করে মানুষগুলোর জীবন দুর্বিষহ করে তোলে। পুলিশে ধরিয়ে দেবার ভয় দেখিয়ে দিয়ে রেশমা বিবিকে ভোগ করতে চায়। নিজেদের একটি নদী,পায়ের তলায় একটু নিজস্ব মাটি,একফালি আকাশের সন্ধানে এগিয়ে চলে তাদের জীবনযাত্রা। লেখিকা পূরবী বরমুদৈ অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে দেশভাগের বলি চর অঞ্চলের মানুষদের জীবনযাত্রার ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন।

অসম আন্দোলনের পটভূমিতে রচিত নিরুপমা বরগোহাঞির 'গোহানী আই গোসাঁনী আই' ১৯৮৭সনে প্রকাশিত হয়। আলোচ্য উপন্যাসের একটি সাধারণ চরিত্র রজব আলীর মাধ্যমে লেখিকা দেশভাগের ফলে পূর্ব পাকিস্তান থেকে সব কিছু ছেড়ে চলে আসা উদ্বাস্তুদের অস্তিত্বের সঙ্কটের কথা বলেছেন। অপু এবং রুণী দুই ভাইবোন। তাদের কথোপকথন,বাদানুবাদের মধ্য দিয়ে অসম আন্দোলনের বিভিন্ন দিক ফুটে উঠেছে। অসম অন্দোলন প্রকৃতপক্ষে দেশভাগেরই ফলশ্রুতি। দেশভাগের ফলে প্রচুর মানুষ তাদের ভিটেমাটি ত্যাগ করে অসমে চলে আসে। ফলে খুব স্বাভাবিকভাবেই অসমের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক জীবনে নানা ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হয়। অসমিয়া জীবনের এই অস্তিত্বের সঙ্কট যুবসমাজকে আন্দোলনের পথে ঠেলে দেয়। অপু অসম আন্দোলনের সমর্থক। সে মনে করে দীর্ঘকাল ধরে উত্তর পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে অসম যেভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা শোষিত হয়ে আসছে সেই শোষণ থেকে মুক্তি লাভ করার জন্য আন্দোলনের পথে এগিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না। এদিকে রুণী মনে করে সুদীর্ঘকাল ধরে যে সমস্ত অ-অসমিয়া জনগোষ্ঠী অসমকে মাতৃভূমি জ্ঞানে অসমের ভাষা সংস্কৃতিকে আপন করে নিয়েছে তাদের হঠাৎ বিদেশি আখ্যা দিয়ে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়াটাকে মানবিক বলা যেতে পারে না। এই আন্দোলন আজ দীর্ঘকাল ধরে পাশাপাশি বসবাস করে আসা হলধর আর রজব আলীর মধ্যে বিদ্বেষের বীজ বপন করায় অপু -রুণীর মা এই ভেবে শঙ্কিত হয়ে উঠেছেন যে নিকট ভবিষ্যতে হয়তো বা হলধর আর রজব আলীকে পরস্পরের বিরুদ্ধে ছুরি শানাতে দেখা যাবে। শ্রীমতী গোস্বামীর তীব্র মানবিকতাবোধে আপ্লুত হয়ে তারই কন্যা রুণী মাকে জড়িয়ে ধরে বলে উঠেছে--'মা

তুমি সত্যিই মা,প্রত্যেকের মা,হলধরের মা,রজব আলীর মা,পৃথিবীর সমস্ত সন্তানেরই মা।' এ যেন রবীন্দ্রনাথের গোরা উপন্যাসের উপসংহারে আনন্দময়ীকে সম্বোধন করে বলা গোরারই প্রতিধ্বনি। --'গোরা কহিল,'মা,তুমিই আমার মা। যে মাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলুম,তিনিই আমার ঘরের মধ্যে বসেছিলেন। তোমার জাত নেই,বিচার নেই,ঘৃণা নেই--শুধু তুমি কল্যাণের প্রতিমা। তুমিই আমার ভারতবর্ষ।--' এভাবেই নিরুপমা বরগোহাঞি আলোচ্য উপন্যাসে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে মানবতার জয়গান করেছেন। এই প্রসঙ্গে আমাদের লেখিকার 'ঠিকানা' গল্পটির কথা মনে পড়ে যায়। গল্পের কেন্দ্রিয় চরিত্র যতীন মজুমদার নিজের ঘর,নিজের পরিবেশ,নিজের আত্মীয় স্বজন ছেড়ে বিদেশ বিঁভূয়ে ছেলের কাছে থাকতে চায় না। তবে বিদেশ বলতে যতীন অসমের বাইরে যাওয়াকেই ভাবে। তবে শেষপর্যন্ত যতীন মজুমদার গান্ধীবস্তির ঘর ছেড়ে ছেলের সঙ্গে অসমের বাইরে থাকতে বাধ্য হয়। জয়পুরে ছেলের কাছে থাকতে এসে বৃদ্ধ যতীন মজুমদার প্রথম প্রথম জয়পুরের সমস্ত কিছুকে অসমের মাপকাঠিতে বিচার করতে চেয়েছিলেন। তার আশেপাশের মানুষগুলোকে 'কেমন যেন গায়ে পড়া স্বভাবের বলে মনে হত।' কিন্তু মাসখানেক যাবার পরেই যতীন মজুমদারের মনোভাব দ্রুত বদলে যেতে থাকে। পাশের ঘরের তিন বছরের পার্লে নামে ছোট ফুটফুটে মেয়েটি কখন যে তার অজান্তেই নাতনির স্থান অধিকার করে নিয়েছে তা তিনি নিজেও বুঝতে পারেন নি। তাই ছেলে রমেন যখন কলকাতায় বদলি হয়ে যায় তখন পার্লেকে ছেড়ে আসতে তার নিজের নাতনিকে ছেড়ে আসার মতোই বেদনা বোধ জাগে। একই অভিজ্ঞতা হয় কলকাতা এবং দিল্লিতে। ততদিনে যতীন মজুমদারের অর্ন্তজগতে এক বিপুল পরিবর্তন ঘটে গেছে। অসমের ক্ষুদ্র ভৌগোলিক গণ্ডিকে অতিক্রম করে ততদিনে গোটা ভারতবর্ষটাই যতীন মজুমদারের ঠিকানা হয়ে উঠেছে। তাই গুয়াহাটিতে ফিরে আসার পরে যতীন মজুমদারের যখন মৃত্যু হয় তার কিছুদিন পরে ছেলে রমেন যখন যতীন মজুমদারের সর্বক্ষণের সঙ্গী ভিআইপি স্যুটকেসটি আবিষ্কার করে,সে বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করে যেখানে একদিন ঠিকানা হিসেবে যতীন মজুমদার,গান্ধীবস্তি, গুয়াহাটি--৩,অসম লেখা ছিল সেখানে জ্বলজ্বল করছে 'যতীন মজুমদার,ভারতবর্ষ '। সেদিকে তাকিয়ে রমেন স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে। তার দুচোখ জলে ভরে আসে।

দিলীপ বরার 'কলিজার আই' অসমের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক অস্থিরতাকে কেন্দ্র করে রচিত হলেও এর সঙ্গে দেশভাগের একটা সুদূর সম্পর্ক অস্বীকার করা যায় না। স্বাধীন ভারতে ধর্মের ভিত্তিতে দেশকে ভাগ করা হলেও প্রচুর সংখ্যক মুসলমান অসম, পশ্চিমবঙ্গ,বিহার,উত্তরপ্রদেশে থেকে যায়। তারপর ১৯৭১ সনে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের সময় বাংলাদেশ থেকে লক্ষ লক্ষ শরনার্থী অসমে এসে আশ্রয় গ্রহণ করে। এইসব শরনার্থীদের অনেকেই পতিত জমি,নদীর চর আর সরকারি সংরক্ষিত অঞ্চলে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। বাংলাদেশ থেকে দলে দলে মানুষ আসে। সেই সঙ্গে ভারতের অন্যান্য রাজ্য থেকে অ-অসমিয়ারা অসমে আগমনের ফলে অসমিয়া ছেলেমেয়েরা ব্যবসা-বাণিজ্য ,সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়তে থাকে। স্থানীয় মানুষের মনে ক্রমশ ধারণা জন্মাতে থাকে এই অবস্থার পরিবর্তন না হলে অসমিয়া জাতির অস্তিত্ব খুব শীঘ্রই বিপন্ন হয়ে পড়বে। এই পটভূমিতেই শুরু হয়েছে অসম আন্দোলন। নেলীর নৃশংস হত্যাকাণ্ড,আইএমডিটি আইন,জরুরি অবস্থার ঘোষণা ,বিভিন্ন দাবিতে হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীর শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ ,কেন্দ্রের শোষণ বিদেশি বহিষ্কারের দাবিতে সমস্ত রাজ্য জুড়ে দিনের পর দিন অফিস আদালত,স্কুল,কলেজ বন্ধথাকা --সমস্ত কিছুই উপন্যাসটিতে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে চিত্রিত হয়েছে।

উপন্যাসটির কেন্দ্রীয় চরিত্র ছাত্রনেতা চিন্ময়। চিন্ময়ের প্রেমিকা শারদী অসম আন্দোলনের দোষত্রুটি সম্পর্কে প্রথম থেকেই চিন্ময়কে সচেতন করে তুলতে চেয়েছিল। উপন্যাসের শেষে আমরা দেখি নতুন পথের সন্ধান করতে গিয়ে চিন্ময় সংগঠনের সংশ্রব ত্যাগ করেছে। তার মনে একসময় নিজেদের কর্মপন্থা সম্পর্কে সন্দেহ দেখা দিয়েছে। --'সাম্যবাদ,পুঁজিবাদ তথা জাতীয়তাবাদের কোন পথ আমরা অবলম্বন করেছি তার কোনো সমাধান আজ পর্যন্ত হল না। অসমের বিভিন্ন জনগোষ্ঠী তথা ধর্মীয় সম্প্রদায় সমূহকে স্বাধীন অসমে কীভাবে একতার বাঁধনে বাঁধা হবে,তারও কোনো সূত্র উদ্ভাবন করা হল না। বড়ো, কার্বি,ডিমাছা, কোঁচ-রাজবংশীর সঙ্গে কুলীন অসমিয়া এবং পূর্ববঙ্গীয় মুসলিম ইমিগ্রেন্টের সমন্বয় কীভাবে হবে,সেই বিষয়েও কোনো গভীর আলোচনা সংগঠনের কোনো রাজনৈতিক মঞ্চে হল না। এতগুলো দ্বিধা নিয়ে স্বাধীন অসমের স্বপ্ন সত্যিকার অর্থে রূপায়িত হওয়া সম্ভব কি?' চিন্ময় জানে বেঁচে থাকতে হলে সামাজিক,আর্থিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা প্রয়োজন। এই পথ যে খুব কঠিন সেই সম্পর্কে তাঁর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। তবে তার একান্ত বিশ্বাস এই নতুন পথে সে শারদীর মতো শুভাকাঙ্খীদের সহযাত্রী হিসেবে পাবে।

সম্প্রতি প্রকাশিত আব্দুস সামাদের 'বৈ যায় চম্পাবতী' (বয়ে চলে চম্পাবতী') উপন্যাসে অসমে বহুকাল ধরে বসবাস করা অভিবাসী মুসলমানদের অস্তিত্বের সমস্যাকে গভীর মমতার সঙ্গে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। অসমের চর অঞ্চলে যুগযুগ ধরে

বসবাস করে আসা দুঃখ,দারিদ্র্য এবং নিরক্ষরতার ছত্রছায়ায় লালিত পালিত এইসব মানুষেরা পরিশ্রমকেই জীবিকার উৎস হিসেবে মেনে নিয়েছে। অথচ খেটে খাওয়া এই মানুষগুলোকে যখন বাংলাদেশী বলে সম্বোধন করা হয় তখন তাঁরা মর্মান্তিক যন্ত্রণা অনুভব করে। এদের প্রত্যেকেরই জন্ম অসমে। অসমের জল হাওয়ায় এদের দেহ পুষ্টি লাভ করেছে। তবুও আজ রাজনৈতিক চক্রান্তে তারাই কিনা বিদেশি। বিদেশি শনাক্তকরণের নামে তাদের বারবার হেনস্থা করা হয়। জাতীয় ঐক্যকে পুরোপুরি অস্বীকার করে বিভেদের রাজনীতিতে মেতে উঠে অসম।

উমাকান্ত শর্মার ‘ভারণ্ড পক্ষীর জাক’ ১৯৯২ সনে প্রকাশিত হয়। বড়োজীবনের অর্ন্তবেদনা আলোচ্য উপন্যাসের উপজীব্য বিষয়। আত্মঘাতী কার্যকলাপ কীভাবে জাতীয় ঐক্য বিনষ্ট করে একটা সমাজে সর্বনাশ ডেকে আনে তারই এক জীবন্ত চিত্র উপন্যাসটিতে তুলে ধরা হয়েছে। উপন্যাসের নামকরণের মধ্যে প্রতীকী তাৎপর্য ব্যঞ্জিত হয়েছে। পঞ্চতন্ত্রে বর্ণিত ভারণ্ড একরকমের পাখি যার দুটি মুখ,একটি পেট। একদিন একটি মুখ অপর মুখকে কোনো অংশ না দিয়ে একাই একটি সুস্বাদু ফল খেয়ে ফেলে। এর প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশে আর একদিন অন্য মুখটি একটি বিষফল পেয়ে একা খেয়ে ফেলে এবং পাখিটির মৃত্যু হয়। বড়ো এবং অসমিয়া একটি পাখিরই দুটো ঠোঁটের মতো। স্বাধীনতা লাভের পর কয়েক দশক অতিবাহিত হয়ে গেছে অথচ বড়োদের জীবনে আশানুরূপ উন্নতি হয়নি। বড়োজনগোষ্ঠীর মধ্যে এই নিয়ে দিনের পর দিন ক্ষোভ সঞ্চিত হয়েছে। ছেছাখুলি আর ছোনাবালি এই দুটি বড়ো অধ্যুষিত অঞ্চলে বিভিন্ন উপজাতির লোকেরা এতদিন ধরে মিলেমিশে বসবাস করে আসছিল। নবজাগ্রত বড়োল্যাণ্ডের দাবিকে কেন্দ্র করে আন্দোলন শুরু হয়। উগ্র অসমিয়া জাতীয়তাবাদ এবং ভাষাপ্রেম বড়োদের নিজেদের ভাষা সংস্কৃতি বিষয়ে সচেতন করে তোলে। অতীতমুখী বড়োসমাজ পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেদের খাপ খাওয়াতে না পেরে প্রমাদ গুনেছে। নানা কারণে অসমিয়া আর বড়োজনগোষ্ঠীর মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছে। প্রব্রজন,অবাঞ্ছিত লোকের অনুপ্রবেশ, বড়োদের মনে আশঙ্কার সৃষ্টি করেছে। বড়ো তরুণদল দুটো দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। রণেন আর রণজিলার মতো একদল তরুণ তরুণী সাংগঠনিক কাজকর্মের মাধ্যমে বড়োদের উন্নতির কথা ভাবে। অন্যদিকে,অলিত এবং উর্মিলারা সংগ্রামের পথ বেছে নয়। চারপাশে হিংসাত্মক কার্যকলাপ ঘটতে থাকে। শান্তির দূত অধ্যাপক দৈমারী এবং বড়োদের পরম হিতাকাঙ্খী প্রধান শিক্ষক রমাকান্ত তরুণ বড়োগোষ্ঠীর কাছে সন্দেহের পাত্র হয়ে উঠে। বিচ্ছিন্নতার মনোভাব চারপাশে রক্তবীজের মতো ছড়িয়ে পড়ে। লেখক দেখাতে চেয়েছেন সমন্বয়ই অসমিয়া গণজীবনের মূল সূত্র। বিভাজন সামাজিক প্রক্রিয়ার অঙ্গ নয় ,রাজনৈতিক চালমাত্র। গৌরীনাথ পূজারী,রমাকান্ত ,রনেন,দেবকান্ত ,অলিত,করেন্দ্র,জয়া,বাছিরাম,টিকারাম ইত্যাদি চরিত্র চিত্রনে লেখকের বলিষ্ঠতার পরিচয় পাওয়া যায়।

অরূপা পটঙ্গীয়া কলিতার ‘ফেলানী’ উপন্যাসের পটভূমি অসম আন্দোলন। বিগত পঁচিশ বছরের অভিশপ্ত সময়ের পটভূমিতে দুঃখী মানুষের যন্ত্রণাক্লিষ্ট জীবনের একটি মর্মস্পর্শী উপাখ্যান। ফেলানী ওরফে মণির মা উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র। তাকে কেন্দ্র করেই উপন্যাসের অজস্র চরিত্র আবর্তিত হয়েছে। জোনের মা,মিনতি,রত্নার মা,আরতি ওরফে কালী বুড়ি,জগুর স্ত্রী ইত্যাদি অসংখ্য চরিত্র জীবনযুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত। কিন্তু এক অনমনীয় জীবনীশক্তি,জীবনের প্রতি অপরিসীম মমত্ববোধ ও ভালোবাসা তাদের সমস্ত প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে অনুপ্রাণিত করেছে।

সাম্প্রদায়িকতার বলি মণির মা নিজের ঘরবাড়ি ও স্বামীকে হারিয়ে ছেলের হাত ধরে ক্যাম্পে এসে হাজির হয়েছিল। চোখের সামনে সে নিজের ঘরবাড়ি জ্বলতে দেখেছে। চারদিকে মৃতদেহ আর তাজা রক্তের চিহ্ন। পায়ের ধাক্কায় একটি শিশুর মৃতদেহ ছিটকে পড়ে। সম্পূর্ণ মানব শিশু নয়,মাঝখান দিয়ে দুফালা করে কেটে ফেলা হয়েছে। মানুষের হিংস্রতার জ্বলন্ত নিদর্শন দেখে মণির মা আতঙ্কে পাথর হয়ে যায়। বস্তির নবীনও তাড়া খেয়ে পালিয়ে আসা মানুষ। আজ তিন বছর ধরে সে এই বস্তিতে রয়েছে। বাজারে বাজারে ঘোরার সময় কিছু অপরিচিত শব্দ তার কানে ঘনঘন আসতে থাকে। ‘বিদেশি’,‘আন্দোলন’,‘আসু’, ‘সংবিধান’,‘ছাত্র সংস্থা’ ইত্যাদি। কয়েকটি নাম ‘প্রফুল্ল মহন্ত’,‘ভৃগু ফুকন’ আদি মানুষের মুখে মুখে ঘুরতে থাকে। মাঝেমধ্যেই বাজারটাতে হুলুস্থূল পড়ে যায়। ছেলের দল এসে দোকান থেকে হাঁস-মুরগী,সামনে যা পায় নিয়ে যায়। পয়সা দেবার কোনো লক্ষণ নেই। ভাবগতিক দেখে মনে হয় জিনিসগুলোর উপর যেন তাদের মালিকানা রয়েছে। চাইলেই দিয়ে দিতে হবে। ‘জয় আই অহম’,‘প্রফুল্ল মহন্ত জিন্দাবাদ’,‘অসম চুক্তি জিন্দাবাদ ইত্যাদি শ্লোগান দিতে দিতে ছেলেরা আলু পেঁয়াজ সামনে যা পায় তাই গোটাতে থাকে। বইটি পড়তে পড়তে মনে হয় আমরা যেন অসম আন্দোলনের সেই ভয়াবহ রক্তাক্ত দিনগুলোতে ফিরে গেছি। চারদিকে ক্ষমতা দখলের লড়াই ,মিলিটারির অত্যাচার,জনগণের আশাভঙ্গের বেদনা আমাদের অন্ত রকেও স্পর্শ করে যায়। তথ্যের প্রতি লেখকের সততা,সবচেয়ে বড় কথা হল এক অপূর্ব নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গি। লেখিকা কোনো বিশেষ জাতি বা ধর্মের

পক্ষ নিয়ে কথা বলেন নি,চোখের সামনে যা দেখেছেন তাই নিরপেক্ষভাবে তুলে ধরেছেন।

হোমেন বরগোহাঞির গল্প 'ইসমাইল শেখর সন্ধানত' দেশভাগের পটভূমিতে রচিত একটি অন্যতম গল্প। রিক্সাচালক অন্নদাচরণ মুখোপাধ্যায়ের দুর্ভাগ্যতাড়িতা দেহোপজীবিনী কন্যার কাহিনি গল্পটিতে অত্যন্ত মর্মন্তুদ ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। দেশ বিভাজনের পরে,সর্বদা পূজা আহ্নিক নিয়ে ব্যস্ত থাকা মুখোপাধ্যায় অন্যান্য সবার সঙ্গে জন্মভূমি পরিত্যাগ করে উদ্বাস্তু হয়ে শিয়ালদা স্টেশনে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। গল্পটির কথক একজন হাকিম। সরকারের আদেশে তিনি হাতির সাহায্যে উদ্বাস্তুদের ঘরবাড়ি ভেঙ্গে দেন। এই ভাগ্যবিপর্যয়ের শিকার উদ্বাস্তুদের মধ্যে ইসমাইল শেখও একজন। সরকারি নির্দেশ পালন করতে গিয়ে তিনি ইসমাইল শেখের জীবনে যে অবর্ণনীয় দুঃখ দুর্দশা ডেকে এনেছেন তার জন্য ইসমাইল শেখের কাছে ক্ষমা চাওয়ার জন্য তিনি তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন। ইসমাইল শেখের কাছে ক্ষমা না পেলে তার শান্তি নেই। প্রাণের ভয়ে ইসমাইল শেখ সরকারি অফিসারের হাত থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। গল্পের কথক তাকে অনুসরণ করে একজন শিক্ষিতা উদ্বাস্তু দেহোপজীবিনী মণিমালার ঘরে এসে উপস্থিত হয়। মেয়েটির বিছানায় আলবার্তো মোরাভিয়ার উপন্যাস 'দ্য উইমেন অফ রোম' দেখে গল্পের কথক তার বিষয়ে জানতে আগ্রহী হন। মণিমালা তার কৌতূহল নিরসন করে। ইসমাইল শেখের মতোই সে ও একজন মানুষের আগে আগে দৌড়ে চলেছে। সেই মানুষটি হল তারই পিতা বিদগ্ধ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত অন্নদাচরণ মুখোপাধ্যায়। শিয়ালদার উদ্বাস্তু শিবিরে একদিন পিতাকে ক্ষুধার জ্বালায় বেশ্যার উচ্ছিষ্ট খেতে দেখে পিতাকে সাংসারিক দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়ার জন্য মণিমালা পালিয়ে এসে দেহোপজীবিনীর বৃত্তি গ্রহণ করে। একদিন পিতাকে সে রিক্সা চালাতে দেখতে পায়। তারপর থেকেই মণিমালা পিতার কাছে ধরা পড়ে যাবার ভয়ে পালিয়ে বেড়াতে থাকে।

এবার আমরা অসমিয়া বাঙ্গালি পারস্পরিক সাংস্কৃতিক সম্পর্ক এবং প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠার সম্পর্কে দুই একটি কথা বলব। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের রামকুমার বিদ্যারত্ন প্রধানত ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে কয়েকবার অসম ভ্রমণ করেন। তার এই ভ্রমণের ভিত্তিতে রচিত হয় 'উদাসীন সত্যশ্রবার আসাম ভ্রমণ'। বইটি ১৮৮১ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। সূক্ষ্মদর্শী রামকুমারের এই গ্রন্থে অসমের সমাজ-সংস্কৃতি সম্পর্কে অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য রয়েছে। অসমের চা শ্রমিকদের দুঃখ-দুর্দশার প্রতিও তাঁর আন্তরিক সহানুভূতি ছিল। তিনি তাঁর 'কুলি কাহিনী'নামের উপন্যাসে চা বাগানের শ্রমিকদের ওপরে চলা অত্যাচারের একটি বিশ্বাসযোগ্য ছবি তুলে ধরেছেন।

ডঃ সূর্যকুমার ভূঞার প্রবন্ধ 'কৃষ্টি সংযোগ' থেকে আমরা জানতে পারি সিপাহি বিদ্রোহের সময় মণিরাম দেওয়ানের উৎসাহে কন্দর্পেশ্বর সিংহ চারিং রাজাকে অসমের সিংহাসনে বসানোর জন্য যে চেষ্টা করা হয়েছিল,তার একজন প্রধান নায়ক ছিলেন চারিং রাজার শিক্ষক বাঙ্গালি মধু মল্লিক। বিচারে তাঁর দ্বীপান্তরের শাস্তি হয়। আলোচ্য প্রবন্ধে শ্রীভূঞা নগাঁও জেলার তিনজন বাঙ্গালি ভদ্রলোক --জানকীনাথ সেন,মদনমোহন বিশ্বাস এবং জন্মেজয় দাস এর নাম উল্লেখ করেছেন। এই তিনজনেই অসমিয়া মেয়ে বিয়ে করেন এবং তাঁদের সন্তান সন্ততিরা অসমিয়া বলে পরিচিতি লাভ করে। জানকীনাথ সেন প্রতিষ্ঠিত রঙ্গমঞ্চে প্রথমবারের জন্য অসমিয়া ঐতিহাসিক নাটক দেবনাথ বরদলৈর 'হেমপ্রভা' অভিনীত হয়। জন্মেজয় দাসকে অসমের টমাস আর্ণল্ড' বলা হয়ে থাকে। তাঁরই অনুপ্রেণায় আনন্দরাম বরুয়া,জালনুর আলী আহমদ,শিবরাম বরা এবং বলিনারায়ণ বরা বিলাতে উচ্চশিক্ষালাভ করে এসে অসমে কীর্তিস্তম্ভ স্থাপন করেছিলেন। সূর্যকুমার ভূঞা স্বয়ং কলেজ জীবনে বাংলা কবিতা লিখে স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে পুষ্পমাল্য লাভ করেছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পত্রিকাতেও তিনি প্রবন্ধ লিখেন।

অসমিয়া গদ্য সাহিত্য যে মধ্যযুগে কতটা শক্তিশালী রূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল ভট্টদেবের 'কথাভাগবত' 'কথাগীতাই' তার জ্বলন্ত নিদর্শন। 'কথাগীতা' পড়ে বাংলার তিনজন মনীষী পণ্ডিতপ্রবর হেমচন্দ্র গোস্বামীকে যে চিঠি লিখেছিলেন তার থেকে ষোড়শ শতকের অসমিয়া গদ্য সাহিত্য যে কতটা উন্নত ছিল তার একটা পরিচয় পাওয়া যায়। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় লিখেন--'Assamese prose literature developed to a stage in the far distant sixteenth century,which no other literature of the world reached except the writings of Hooker and Latimer in England.....The Katha-Gita shows clearly that the Assamese literature developed to a standard in the sixteenth century which the Bengali literature had reached only in the time of Iswarchandra and Bankimchandra.

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় 'কথা-গীতা' সম্পর্কে বলেন --'The people who could write Gita in such prose in the sixteenth century was not a small people.'এবার আমরা 'কথা-গীতা' সম্পর্কে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মন্তব্য উল্লেখ করব। হেমচন্দ্র গোস্বামীকে তিনি চিঠিতে লিখেন --'It is a very striking

book,interesting from many points of view. You may very well be proud of the author of this book who could handle prose in such a remarkably lucid style more than a century before we had any prose book in Bengal.'

কটন কলেজের অধ্যাপক পদ্মনাথ ভট্টাচার্য বিদ্যাবিনোদ ছিলেন 'কামরূপ অনুসন্ধান সমিতি'র প্রতিষ্ঠাতা এবং 'কামরূপ শাসনাবলী'র প্রণেতা। অসম সাহিত্য সভার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও তাঁর একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। অতুলচন্দ্র বরুয়া প্রণীত শরৎচন্দ্র গোস্বামী নামের জীবনীগ্রন্থে এই তথ্য পাওয়া যায়।

অসমিয়া সংস্কৃতিতে বাঙ্গালিদের অবদান অনস্বীকার্য। অসমের সংস্কৃতি এককভাবে গড়ে উঠেনি। একের সঙ্গে অন্যের ভাব সম্মিলনের ফলেই অসমিয়া সংস্কৃতি জন্মলাভ করেছে। এক শতাব্দীরও অধিককাল ধরে অসমের বিশেষ করে ডিব্রুগড়ের এবং উজনি অসমের বাঙ্গালিরা কেবল বাংলা ভাষা এবং সাহিত্য নয় ,অসমিয়া ভাষা সাহিত্যেরও অধ্যয়ন করে আসছে। আধুনিক অসমিয়া প্রগতিশীল কবিতার পথিকৃৎ ধীরেন দত্ত (১৯১০--১৯৭২) অসমের প্রথম সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদী কবি। ধীরেন দত্তের পৈতৃক বাড়ি ছিল বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার কাছে। ধীরেন দত্তের 'কাঠমিস্ত্রীর ঘর' এবং 'জয়া মরা নাই' কবিতা দুটি অসমিয়া কাব্য সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। কবি নবকান্ত বরুয়ার মতে 'দশটা সর্বকালীন শ্রেষ্ঠ অসমিয়া কবিতার মধ্যে একটি হল 'কাঠমিস্ত্রীর ঘর'। গুণাভিরাম বরুয়ার বিখ্যাত 'রামনবমী' নাটকটি আবিষ্কার করে সম্পাদনা এবং প্রকাশ করেন গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান পণ্ডিত যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য। তিনি হলিরাম ঢেকিয়াল ফুকনের 'আসাম বুরঞ্জী'ও সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন।

অসমিয়া বাঙ্গালি পারস্পরিক বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমেও সাংস্কৃতিক বিনিময় সংঘটিত হয়েছিল। সাহিত্যরথী লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতৃ এবং মহর্ষি দেবেনদ্রনাথ ঠাকুরের তৃতীয় পুত্র হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দ্বিতীয় কন্যা প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবীকে বিয়ে করেন। সাহিত্যরথীর তিন কন্যার মধ্যে প্রথম কন্যা অরুণার বিয়ে হয় সত্যব্রত মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। দ্বিতীয় কন্যা রত্নার বিয়ে হয় ডিব্রুগড়ের বিশিষ্ট চা ব্যবসায়ী এবং তৃতীয় কন্যা অসমিয়া চলচ্চিত্র নির্মাতা রোহিনীকুমার বরুয়ার সঙ্গে। আসামবন্ধুর সম্পাদক উনিশ শতকের অসমিয়া নবজাগরণের পুরোধা ব্যক্তি গুণাভিরাম বরুয়ার কন্যা স্বর্ণলতার প্রথমে কলকাতার ডাক্তার নন্দকুমার রায়ের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল। নন্দকুমারের অকাল মৃত্যুতে স্বর্ণলতার পুনরায় বঙ্গদেশের ক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরীর সঙ্গে বিয়ে হয়। গুণাভিরাম বরুয়ার পুত্র জ্ঞানদাভিরাম বরুয়ার 'মোর কথা' থেকে জানা যায় যে স্বর্ণলতার সঙ্গে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের বিয়ের প্রস্ত াব এসেছিল। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ সেই প্রস্তাবে সায় দেন নি। জ্ঞানদাভিরাম বরুয়া ঠাকুর পরিবারের অরুণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা লতিকা দেবীকে বিয়ে করেন। তাঁদের একমাত্র কন্যা ইরা বরুয়ারও বিয়ে ঠাকুর পরিবারেও হয়েছিল। এখানে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে বিখ্যাত অভিনেত্রী শর্মিলা ঠাকুর ইরা বরুয়া ঠাকুরের কন্যা।

এবার আমরা অসম-বাংলা সংস্কৃতির প্রাণপুরুষ হেমাঙ্গ বিশ্বাসের কথা বলব। ১৯১২ সালে শ্রীহট্টের মিরাছী গ্রামে হেমাঙ্গ বিশ্বাসের জন্ম হয়। কমিউনিস্ট পার্টির নির্দেশে ১৯৪২ সালে হেমাঙ্গ বিশ্বাসের নেতৃত্বে গঠিত হয় --ভ্রাম্যমান সাংস্কৃতিক দল -সুরমা ভেলি কালচারাল স্কোয়াড '। ইতিমধ্যে প্রগতিশীল লেখক সংঘের জন্ম হয়েছিল। হেমাঙ্গ বিশ্বাস তারই আদর্শে গঠন করেন 'সিলেট সাহিত্য চক্র'। ১৯৪৩ সনে বোম্বাইয়ে প্রথম সর্বভারতীয় সম্মিলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মিলনে 'সুরমা ভেলি কালচারাল স্কোয়াড' অংশগ্রহণ করে। হেমাঙ্গ বিশ্বাস নিজে বোম্বাই যেতে না পারলেও 'প্রগতিশীল লেখক সংঘ' এবং 'ভারতীয় গণনাট্যের সঙ্গে যোগসূত্র গড়ে ওঠে। ১৯৪৫ সনে হেমাঙ্গ বিশ্বাস 'সুরমা ভেলি কালচারাল স্কোয়াড ' নিয়ে এক মাসেরও অধিককাল অসমের বিভিন্ন জায়গা ভ্রমণ করে সাংস্কৃতিক কার্যসূচি পরিবেশন করে। সাক্ষাৎ হয় অসুস্থ এবং শয্যাশায়ী জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালার সঙ্গে। পরের বছর ১৯৪৬ সনে শিলচরে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের অসম শাখার প্রথম সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত করা হয় জ্যোতিপ্রসাদকে। অসুস্থতার জন্য শিলচরের সম্মেলনে যোগদান করতে না পারলেও তিনি এই নির্বাচনকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করেছিলেন। জ্যোতিপ্রসাদের প্রতি হেমাঙ্গ বিশ্বাসের গভীর শ্রদ্ধা ছিল। ১৯৫৩ সনে গণনাট্য সঙ্গের অসম শাখার উদ্যোগে প্রথমবারের জন্য অসমে জ্যোতিপ্রসাদের মৃত্যুদিবস উদযাপিত হয়। এটা সম্ভব হয়েছিল হেমাঙ্গ বিশ্বাসের তৎপরতায়। জ্যোতিপ্রসাদ,মঘাই ওজা ছাড়াও বিষ্ণুপ্রসাদ রাভা,ফণী শর্মা,ভূপেন হাজরিকা,লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া ইত্যাদি অসমের জাতীয় সংস্কৃতির পুরোধা ব্যক্তিদের বিষয়ে হেমাঙ্গ বিশ্বাস কেবল মূল্যায়ন করেই ক্ষান্ত থাকেন নি ,তাঁদের ,
কীর্তিকে বাংলার সাংস্কৃতিক জগতের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে পারস্পরিক সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের পথটিকেও প্রশস্ত করে তুলেছিলেন।

মূলত তাঁর প্রচেষ্টাতেই ভূপেন হাজরিকা সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার হেলসিঙ্কিতে অনুষ্ঠিত শান্তি সম্মেলনে যোগদান করেছিলেন।

শিল্পী দিলীপ শমর্ষ্টকে সমাজতান্ত্রিক চিনে প্রতিনিধিরূপে পাঠানোর মূলেত্ত ছিলেন হেমাঙ্গ বিশ্বাস। ষাটের দশকের ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা যখন অসমের আকাশ বাতাসকে কলুষিত করে তুলেছিল তখন লোকসঙ্গীত শিল্পী হেমাঙ্গ বিশ্বাস এবং ভূপেন হাজরিকার মিলিত প্রয়াসে গণনাট্যের মাধ্যমে দাঙ্গাবিধ্বস্ত অঞ্চলের মানুষ আবার নতুন করে মিলনের স্বপ্ন দেখেছিল। অসমিয়া কৃষকের ভূমিকায় সেদিন রংমনরূপী ভূপেন হাজরিকা গেয়েছিলেন ঃ

লুইতর চাপরিত চাকৈয়ে কান্দিলে
মানুহর নাওখন চাই
মানুহর দুখতে মানুহ বুরিব
আনকচোন দোষিবর নাই।

অন্যদিকে পদ্মার উজানে ভেসে আসা উদ্বাস্তু বাঙালি কৃষক হারাধনরূপী হেমাঙ্গ বিশ্বাস গেয়েছিলেন ঃ

আমার ভাঙ্গা নাওয়ে বন্ধু তুমি দিলাই পাল
আমি ধরলাম বৈঠা বন্ধু তুমি ধরলাই হাল।
এ মিলন গাঙে আনলো বলে কে বিভেদের বান
চর ভাঙ্গিল,ঘর ভাঙ্গিল ডুবলো সোনার ধান।

এবার আমরা দেশভাগের ফলে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত অসমের ব্রহ্মপুত্র এবং বরাক উপত্যকার বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়া হাজার হাজার উদ্বাস্তদের জীবনে নতুন করে যে অস্তিত্বের সংকট দেখা দিয়েছে তা নিয়ে উত্তর পূর্বাঞ্চলে বিশেষ করে অসমের বরাক ও ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় যে সমস্ত বাংলা ছোটগল্প লেখা হয়েছে তারই একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে চেষ্টা করব। প্রথমেই আমরা মলয়কান্তি দে'র 'আসরাফ আলির স্বদেশ' গল্পটি আলোচনা করব। অসমের বিদেশি খেদা আন্দোলনের বলি প্রধানত বাঙালি এবং ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষেরা। দুইবছর আগে দাপুটে কাদের মিঞার নজর পড়ে আসরাফের জমির দিকে। আসরাফের জমি গ্রাস করার জন্য কাদের মিঞা নানারকম ফন্দি-ফিকির খোঁজে। কাজটা একটু কঠিন। কারণ আসরাফ কখনও কাদেরের কাছ থেকে টিপছাপ দিয়ে জমি নেয়নি। তবু কাদের মিঞা আসরাফের বিরুদ্ধে মামলা সাজায়। তবে এক আশ্চর্যভাবে আসরাফ মামলায় জিতে যায়। আর তাতেই কাদের মিঞার জিদ আরও বেড়ে যায়। মামলায় হেরে গিয়ে কাদের মিঞা সোজা রাস্তায় না হেঁটে বাঁকা পথ ধরে। দেশ জুড়ে তখন বহিরাগত নিয়ে আন্দোলন চরমে পৌছেছে। তাই খুব সহজেই কাদের মিঞার ষড়যন্ত্রে আসরাফ আলি বাংলাদেশী বলে প্রমাণিত হয়। শৈশবে বাজানের সঙ্গে আসরাফ আত্মীয় ইরফানের চক্রান্তে ভিটে মাটি হারিয়ে হিন্দুস্থানে এসেছিল। অনেকদিন এখানে বসবাস করার পর তার শিকড় যখন এখানের মাটিতে জাকিয়ে বসতে চলেছে ঠিক তখনই কাদের মিঞার চক্রান্তে আবার তাকে উৎখাত হতে হয়। এক যুগ আগে যে দেশ অনেক বেদনায় ,লাঞ্ছনায় ছেড়ে এসেছে আবার কি সেখানে ফিরে যাওয়া যায়? বোধহয় যায় না। তাই আসরাফের মতো মানুষেরা ডিপোর্টেড হলে পুনরায় নিজ ভূমির সন্ধানে ফিরে আসে। --'ফুটপাথে কিংবা রেলের প্লাটফর্মে ভিড় বাড়ায়। আর স্বপ্ন দেখে দেশ,ঘর,জমি,ফসল...। সীমান্তে র পারে যেখানে আসরাফদের ছেড়ে আসা হয় সেখানে দাঁড়িয়ে আসরাফের মনে হয় --'পৃথিবীর কোথাও তার কোনো স্বদেশ নেই। ইরফান চাচা পাকিস্তানে তার স্বদেশ কেড়েছে,হিন্দুস্তানে কাদের মিঞা। স্বদেশ তো এখন ওদেরই মুঠোয়। আর আসরাফ? নো ম্যানস ল্যাণ্ডে দাঁড়িয়ে আসরাফ এখন নো ম্যান--একটা নন এনটিটি। গল্পটির উপসংহার আমাদের সাদাত হোসেন মান্টোর 'টোবাটেক সিং' এর কথা মনে পড়িয়ে দেয়।

এই প্রেক্ষাপটেই রচিত অরিজিৎ চৌধুরীর 'নিরালম্ব'। বাংলাদেশের হিন্দু নাগরিক সৌম্য করিমগঞ্জে তার আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়াতে আসে। উদ্দেশ্য এখানকার মাটিতে একটা ছোটখাট আস্থানার ব্যবস্থা করা। সে ভেবেছে পিসতুতো ভাইদের কাছ থেকে একটু উৎসাহ পেলে ভারতের মাটিতে পাকাপাকি ভাবে চলে আসবে। কিন্তু হেমন্ত এবং শ্রীমন্তে র কাছ থেকে সে যখন জানতে পারে এদেশের মাটিতে জন্মলাভ করেও তারা ডাউটফুল ভোটার,তখন তার সমস্ত আশা ভরসা মিলিয়ে যায়। সৌম্য যখন বাংলাদেশে সিকিউরিটির অভাবের কথা বলে তখন সবাই একবাক্যে জানায় --'সিকিউরিটি আমরার আছে নি? টাউনো থুড়াথুড়ি অখনো আছে,তবে বেশিদিন থাকত নায়। আর গাউত তো একেবারেউ নাই। কত রিফিউজি যে বরাকভ্যালির গাউত থাকিয়া গত কয় বছরে দ্বিতীয়বারের মতো রিফিউজি অইলা,তার কুনো হিসাব কেউ কুনোদিন করছে নি?' দেশভাগের বলি হয়ে এদেশে ভাগ্যান্বেষণে চলে আসাটা যে অনেকের কাছেই নতুন করে অস্তিত্বের সঙ্কট হয়ে দাঁড়িয়েছে তারই প্রতিফলন ঘটেছে আলোচ্য গল্পে।

অভিজিৎ চক্রবর্তীর 'সন্তোষ বিশ্বাসের গল্প' উদ্বাস্তু জীবনের গুরুত্বপূর্ণ দলিল হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশ থেকে আগত ঝাঁকেঝাঁকে মানুষ তখন বেঙ্গলে,অসমে জায়গা কিনে রাখছে। সমাজে যারা সম্ভ্রান্তলোক--ডাক্তার,উকিল প্রত্যেকেই রাণাঘাটের দিকে মাটি নিয়েছে। অনেকের মতো সন্তোষ বিশ্বাসও সাতান্ন সালে পাকাপাকিভাবে অসমে চলে আসে। তারপর থেকেই তার ঢেউয়ের মাথায় জীবন। ১৯৬০ সালের ভাষা আন্দোলন থেকে ২০০৩ পর্যন্ত জাতীয়তাবাদী আন্দোলন,সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ইত্যাদি নানা কারণে তাঁদের শুরু হয়েছে ক্যাম্পের ক্লেদাক্ত জীবন। তাই গল্পের শেষে সন্তোষ বিশ্বাসের মুখ দিয়ে লেখক এক অমোঘ প্রশ্ন উত্থাপন করেন। --'কে আমি ? কার আমি? ...আমি বাঙালির কেউ হতে পারলাম না,অসমিয়ার কেউ হতে পারলাম না, বোড়োদেরও কেউ হতে পারব না,জানি।' এই বেদনা,এই অস্তি ত্বের সঙ্কট এখানকার প্রতিটি বাঙালির।

পরিতোষ তালুকদারের ছোটগল্প 'শিকড়'। গল্পের কথক রিক্সাচালকের আচার আচরণ এবং ভাষা থেকেই বুঝতে পারে যে সে স্থানীয় লোক নয়। বাংলাদেশ থেকে ধুবড়ি হয়ে বর্তমানে গুয়াহাটি শহরে স্থিতু হয়েছে। গল্পের কথকের মনে হয় একদিন সমগ্র অসম এইসমস্ত বাংলাদেশীতে ভরে যাবে। মাছ বল,সব্জী বল,যে কোনো হাজিরা লেবার ,সবেতেই ওদের লোক । কী গ্রাম,কী শহর,হাজিরা খাটাতে বাংলাদেশীদের মতো লাভজনক আর কিছু নেই। ...অনেকটা রোবটের মতো। নিজের মতো করে চালানো যায়। বাংলাদেশী বলে যাকে কৃপার চোখে দেখেছিল সেই সাধারণ রিক্সাওলার,অসমের সাংস্কৃতিক জগতের পুরোধা জ্যোতিপ্রসাদের প্রতি ভালোবাসা ও অপার শ্রদ্ধাবোধ দেখে গল্পের কথকের চোখের সামনে থেকে অহঙ্কাবের পর্দাটা সরে যায়। অশিক্ষিত রিক্সাওলার শীর্ণ হাত দুটি টেনে এনে কথক ক্ষমা চেয়ে নিয়ে বলে --'আমাকে ক্ষমা করো ভাই ...তোমার মতো আসামপ্রেমী আর কে আছে? তোমার শেকড় ছেঁড়া হলেও এদেশের জল-মাটি-বায়ুতে আবার তা গেঁথে গেছে। পল্লবিত হয়েছে শাখা-প্রশাখা। তুমিই আসল ভূমিপুত্র।'

হিমাশিস ভট্টাচার্যের 'বিদেশী' গল্পটিতে ও বরাক উপত্যকার মানুষের অস্তিত্বের সমস্যাকে তুলে ধরা হয়েছে। অসম ইতিহাসের একটি বাস্তব প্রেক্ষাপট দিয়ে গল্পের শুরু হয়েছে। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ভোটার তালিকায় তখন অনেক রদবদল করা হচ্ছে। একের পর এক মানুষকে বিদেশির তকমা পরিয়ে দিয়ে থানা থেকে তাদের ডেকে পাঠানো হত। প্রবীণ সদস্য দীনুখুড়ো দুলালের কাছ থেকে জানতে পারে যে তাদের কেসগুলোর আবার শুনানি হবে কেননা ভারতের নির্বাচন কমিশন পনেরো লক্ষ মানুষের নাম ভোটার লিস্ট থেকে কেটে দেবার সঙ্গত কারণ জানতে চাইছে। দুলালের মুখ থেকে এই আশার বাণী শুনে দীনুখুড়োর মনে দেশভাগ জনিত বেদনা দায়ক স্মৃতিগুলো ভেসে উঠে। আমরা জানি কেউ হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে ভালোবাসে না। তবে দেশভাগের এই ক্ষতি যে প্রতিমুহূর্তে দীনুখুড়োর মতো এতদঞ্চলের লোকদের সূচিবিদ্ধ যন্ত্রণায় দগ্ধ করছে। তাই দীনুখুড়োর মনে হয় --'হঠাৎ করে একটা সীমারেখা টেনে দেওয়া হল। কাগজপত্রে কটা চিহ্ন আর পিলার পুঁতে দিলে কি মানুষের মনকেও ভাগ করা যায়?' গল্পটিতে আমরা শুনানি শিবিরের একটি ছবি দেখতে পাই। নিজেদের নাগরিকত্ব প্রমাণের জন্য দীনুখুড়োদের সরকারি অফিসার এবং রাজনৈতিক নেতাদের করুণার জন্য হা-পিত্যেশ করে বসে থাকতে হয়। দূরদৃষ্টির অভাব শূন্য এবং নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগের সঙ্গে চিরকাল লড়াই করে আসা এই সমস্ত সহজ সরল মানুষগুলোর হাতে বসবাসের প্রামানিক কোনো তথ্য না থাকায় কয়েক পুরুষ অসমে বসবাস করেও আজ তারা শিকড়হীন। এভাবেই বরাক এবং ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার বাংলা ছোটগল্পে এখানকার ইনার ডায়াস্পোরিক বাঙালির নতুন অভিব্যক্তির প্রকাশ ঘটেছে। গল্পগুলো হয়ে উঠেছে এখানকার অশান্ত সময়ের দলিল।

বাসুদেব দাস
অনুবাদক এবং প্রাক্তন ছাত্র ,বাংলা বিভাগ ,গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়